এলেম নতুন দেশে

— ০ —

দীপ্তি কর

বিদেশে যাব, জার্মানিতে – মেয়ের কাছে। প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন ধরে। প্রথমে পাসপোর্ট তারপর ভিসার বাধা পার করে এসে গেল যাবার দিন। দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে ছ'টার মধ্যে। ছোট মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। সেখানে আরো তিনজন আমাদের সহযাত্রী। চেকিং পর্ব শেষ করে গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছি। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ। এক এক করে পৌঁছে গেলাম প্লেনের ভেতরে। ভীষণ উত্তেজনা, আনন্দ, ভয় সবকিছু মিলিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি আন্তর্জাতিক বিমানের কারিগরি, আরামদায়ক সীট, সামনে টি,ভির পর্দা। আবার ভাগ্যক্রমে জানালার পাশের সিটটা পেয়েছি। কাজেই খুব আনন্দ। একটু পরেই প্লেন ছাড়ার ঘোষণা হল, আমরাও সিট বেল্ট পরে রেডি। প্লেন এবার দৌড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে রানওয়ে ছেড়ে ওপরে উঠতে লাগল। একটু ঝাঁকুনি, অনেকটা মজা। দেখতে লাগলাম

গাছপালা, বাড়িঘর, নদী পুকুর ধীরে ধীরে সব ছোট হয়ে যাচ্ছে – Doll's house এর মত। তারপর মেঘেরা ঘিরে ফেললো সব – আর কিছু দেখা যাচ্ছেনা। একটু পরে দেখি মেঘের দল নীচে, আমরা ওপরে – মনে হচ্ছে এক একটা ভেড়া এক এক দল মেঘের অধীনে। তারপর তো মেঘের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলা একটানা। সামনে টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে প্লেন কিভাবে কোথা দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিমানসেবিকারা হাসিমুখে খাবার পরিবেশন করছে, কাজেই পেটপুজোর কোনো ত্রুটি হচ্ছেনা। তারপর এসে নামলাম চোখধাঁধানো বিশাল এয়ারপোর্ট দুবাইতে। সেখান থেকে দুঘন্টা পরেই উঠে পড়লাম কাস্টমস বিমানে। অবশেষে গন্তব্য মিউনিখে যাত্রা শেষ হল। ভিসা চেকিংয়ের পালা চুকিয়ে বাক্সপ্যাটরা সংগ্রহ করে এগিয়ে গেলাম অপেক্ষমান মেয়ে জামাইয়ের দিকে। নাতির হাত ধরে উঠে পড়লাম গাড়িতে। এগিয়ে চললাম সন্ধ্যার অন্ধকার মাখা অপরূপা মিউনিখের

রাস্তা ধরে চারপাশের ছবি দেখতে দেখতে।
পরের দিন সকাল সকাল উঠে রেডি হয়ে নিলাম নাতিকে স্কুলে ছাড়ার জন্য সেই সঙ্গে আশেপাশটাও দেখা হবে। মসৃন পরিষ্কার রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। দুপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। প্রতিটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পিছনে আছে ছোট পার্ক আর সবুজ মাঠ। রাস্তার পাশে বড় বড় ঘন সবুজ গাছ। রাস্তা নাকি বাড়ির চৌহদ্দি! ফুটপাথের অর্ধেকটা সাইকেল, রোলার স্কুটার চালানোর জন্য নির্দিষ্ট। রাস্তা পেরোনোর জন্যে রয়েছে সুন্দর সিগন্যাল ব্যবস্থা। একটা ওভারব্রিজ পেরোলাম। নীচে অসংখ্য গাড়ি প্রচন্ড স্পীডে যাতায়াত করছে কিন্তু দমকল অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া আর কোনো হর্নের আওয়াজ নেই। স্কুলের কাছাকাছি একটা ফোয়ারা রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের চাতাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে জলের ধারা নীচে পড়ছে। রাস্তার পাশে বসার বেঞ্চ আছে কিন্তু ঝরাপাতা ছাড়া আর

কোনো ময়লা নেই। একজায়গায় দেখলাম রাস্তার পাশে স্ট্যান্ডে খবরের কাগজের বান্ডিল রয়েছে, পাশে আছে ফুটো করা বাক্স। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যার কাগজ পড়ার ইচ্ছা সে বাক্সে টাকা ফেলে কাগজ নিতে পারে। না, কেউ পয়সা না দিয়ে নিয়ে পালাচ্ছেনা।

আরো একটা জিনিস লক্ষণীয়, এখানে রাস্তার পাশে নেই কোনো চা বা পান বিড়ির দোকান যেগুলো আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি পরিবেশ নোংরা করার উৎস। এখানে যা কিছু কেনাকাটা সব শপিং মলে। সেখানে রয়েছে সবজি ফল থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের জিনিস। তাদের রকমারি সম্ভার দেখতে গেলে কয়েক ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। তবে দাম শুনলে চমকাতে হবে, অবশ্য জিনিসের মান নিয়ে সমস্য নেই, চমকের আরো বাকি ছিল, একদিন একটা মলে Toilet use করতে গেছি – দেখি মেয়ে একটা coin ফেলল

ভাবলাম হয়ত 5 টাকা। পরে শুনি তার মূল্য আমাদের দেশের 40 টাকা। তখনই ভাবলাম রামদেবের সঙ্গে internet-এ যোগাযোগ করতে হবে যোগবলে Toilet Control শেখার জন্য অন্তত বিদেশে যতদিন বাস।

এখানে একটা জিনিস আমাকে নাড়া দিয়েছে সেটা হল এখানকার ছোটো বড় সব মানুষের সচেতনতা। শুধু নিজের বাড়িটুকু নয়, নিজের এলাকা তথা সমস্ত দেশটাকে ভালবাসে বলেই সমস্ত নিয়ম মেনে চলে, রাস্তাঘাট নোংরা করেনা থুতু, পানের পিক ফেলে; নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া আবর্জনা নেই করেনা – তাই মশা মাছির উপদ্রবও নেই। একদিন কাছেই একটা লেকে গেলাম। বিশাল লেক আর তার চারিদিকে রয়েছে প্রচুর গাছ, মসৃণ রাস্তা; ছোট বড় সবার জন্য নানান ব্যায়ামের নানান ব্যবস্থা; আর রয়েছে অসংখ্য হাঁস আর জলচর পাখি। কেউ এদের বিরক্ত করেনা, মেরে খায়ওনা। তাই যখন সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়ে সবাই বসে থাকে বা স্নানবাথ নেয় এরা নির্ভয়ে এদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন ওদের এক বন্ধুর বাড়ি গেলাম মূল শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে। তাদের বাড়ির সামনেই লেবেল ক্রসিং। সেই ক্রসিং পেরিয়ে বাঁধানো রাস্তা সোজা চলে গেছে খানিকটা দূরে একটা চার্চ পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে। গ্রামের নাম শুনে কৌতূহলবশত এগিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। একপাশে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত চাষের ক্ষেত। ভুট্টা আর গম চাষ হয়েছে। আমাদের দেশের মত আল ঘেরা ছোট ছোট জমি নয়, একটানা ক্ষেত। যন্ত্রের সাহায্যে মাটি কোপানো, শস্য ফলানো, ফসল কাটা সব হয়, আর একদিকে কাঠ দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গা, ভাবলাম বুঝি জমি দখলে রাখা হয়েছে, তা নয় - সেগুলো ঘোড়া রাখার জায়গা। সব বাড়িতেই আছে ঘোড়া। রাস্তার পাশে সারি সারি গাছে দেখি ফল ভর্তি। একটু কাছে গিয়ে দেখে তো আমি শিহরিত। আরে, এযে আপেল! আমাদের দেশের সেই মহার্ঘ ফল এখানে রাস্তার পাশে বিনা প্রহরায়! আনন্দে ভেসে গিয়ে আপেল

কুড়োতে লাগলাম কিছু পেড়েও নিলাম, শুনে আশ্চর্য হলাম যে এইসব গাছ এমনভাবেই পাকা আপেলের সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সরকারী লোক এসে পেড়ে নিয়ে যায় সরকারী খামারে। সরকারী জিনিস আমার জিনিস ভেবে কেউ সেগুলো নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়না।

এবারে আসি এখানকার মেয়েদের প্রসঙ্গে। এই দেশে তো নারী পুরুষে কোন ব্যবধান নেই, বাস ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, এয়ারপোর্টের পোর্টার, টোল প্লাজার কাজেও মহিলারা অনায়াসে দক্ষ। তেমনি আমাদের বাঙালী মেয়ে তথা বধূদের দেখেও মন ভরে যায়। তারা দশভুজার মত সংসারের টুকিটাকি কাজ - বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার, রান্না করা, বাচ্চা সামলানো, বিদেশী আদবকায়দা, আবার চাকরি করে বাইরের কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে করে, তারপরেও এরা নিজেদের সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে, রকমারী খাবার বানায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

অংশ নেয়। মেয়েদের এই রূপের জন্যেই দুর্গাপুজো। আর এখানকার বাঙালি পরিবারগুলিও নিজেদের মধ্যে এক সম্প্রীতির বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। কখনো নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পার্টি করে, কখনো বা অনেকে মিলে বেড়ানোর প্রোগ্রাম করে জীবনের ধারাকে পুষ্ট করে চলেছে। দুর্গাপুজোর আয়োজন ও সেই সৌহার্দ্যের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তোলে। দেশের থেকে আপনজনদের থেকে অনেক দূরে এসেও এরা একে অন্যের আত্মজন হয়ে বৃহৎ পরিবার গড়ে তুলেছে। নতুন দেশে এসে নতুন সঞ্জীবনায় হৃদয় মন আপ্লুত হল।